বিউগলের শব্দ যখন কাঁদে

অবনি অনার্য

সাধারনত ছোটবেলায় বা"চারা বাবাকেই নিজের আদর্শ হিসাবে বিবেচনা করে, স্বপ্ন দেখে একদিন নিজেও বাবার মতো বড়ো হবে। কেবল দৈহিক বিচারে বড়ো হওয়া নয়, সৎ আদর্শবান পিতার সন্তানরা বাবার সততা-আদর্শকেও নিজের জীবনের জন্য আদর্শ হিসাবে বিবেচনা করে। খুব ছোটবেলায় বাবার কাজকে কেবল গুর"ত্বপুর্ণ বিবেচনা করা হয়, পুরো পরিবারের জন্য তাঁর উৎসর্গকেই প্রধান মনে করা হয়, উপার্জনের উপায় বিচারের বাইরে থাকে। এই সন্তান বড়ো হতে হতে একদিন বাবার কাজের বিচার শুর" করে, প্রথমত নিজে নিজে, ভেতরে ভেতরে, প্রকাশ না করে। যদি তার কাছে মনে হয়, তার বাবা সঠিক কাজ করছেন, তবে বাবার প্রতি শ্রদ্ধার জায়গা আরো পাকা হয়; কেননা এবার ভক্তির সাথে যুক্ত হলো যুক্তি। আর যদি সন্তান বুঝতে পারে, তার বাবার উপার্জনের পথ আসলে অবৈধ, তাহলে ঠিক তার উল্টো হয়, এতোদিনকার শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় চিড় ধরে। সেক্ষেত্রে দুটো ঘটনা ঘটতে পারে– মনোগঠনের দিক থেকে যারা এক্সট্রোভার্ট ধরনের তারা সরাসরি প্রতিবাদ করে, কথা কাটাটাটি হয়, জল আরো গড়ালে ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটে, এমনকি শেষ পর্যন্ত সম্পর্ক ছেদও ঘটতে পারে। আর যারা মনোগঠনের দিক থেকে ইনট্রোভার্ট কিছিমের তারা প্রতিবাদ করে না বটে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তার মধ্যে ক্ষোভ জন্ম নেয়; প্রকাশ করতে পারে না, কেননা সে জানে বাবা বাবাই, ভেতরের অনি"ছা সত্ত্বেও বাবার সঙ্গে বি"ছেদ আকা•ক্ষা করে না। কিন্তু, অবশ্যই অবশ্যই বাবার প্রতি শ্রদ্ধা দুরীভুত হয়, বাইরে যতটা প্রকাশ ঠিক ততটাই ভান।

আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে সামরিক শক্তির চেয়ে অনেক বেশি অবদান বেসামরিক শক্তির। কিন্তু, বেসামরিক লোকজনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ অনেকটাই ঐ"ছিক। কাগজে কলমে (অফিসিয়ালি) যুদ্ধের বিষয়টা কিন্তু সামরিক অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যে-কারণে, যুদ্ধের সময় সামরিক অঞ্চলে সর্বো"চ আক্রমণ করলেও সেটা যুদ্ধাপরাধ নয়, কিন্তু সাধারণ লোকজনের উপর অন্যায় হামলা করলে সেটা যুদ্ধাপরাধ হিসাবে আজো বিবেচিত। মনে হ"ছ, দেশ বাঁচানোর দায়িত্ব আসলে সামরিক বাহিনীর। যুক্তির বিচারেও সেটা প্রতিষ্ঠিত– আমরা আমাদের রাষ্ট্রীয় অর্থের একটা বড় অংশ খরচ করছি এই সামরিক খাতে সেতো যুদ্ধ ইত্যাদি সময়ে আমাদের রক্ষা করার জন্যই। কিন্তু দেশকে যেহেতু আমরা মাতৃ জ্ঞান করি, ফলত মাকে দেখার দায়িত্ব পুরোপুরি সহোদরের উপর ছেড়ে দেয়া যায় কি! বিশেষত, মায়ের যখন মুমুর্ষু অবস্থা। তাই এ-দায়িত্ব আমরা নিজেরাই বণ্টন করে নেই। পৃথিবীর সব জাতিই তাই করে, এমন কোনো স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা আমার জানা নেই যেখানে কেবল সামরিক বাহিনী যুদ্ধ করেছে, কোনো সিভিল জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়াই কোনো জাতি স্বাধীনতা লাভ করেছে। কিন্তু সাধারণ জনগণ আক্ষরিক অর্থেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করলেও সামরিক বাহিনীর জন্য সেটা কিন্তু ফরজ। কেবল যুদ্ধ করেই অনেক ক্ষেত্রে বেসামরিক জনগণের দায়িত্ব শেষ হয়ে গেলেও সামরিক বাহিনীর দায়িত্ব শেষ হয় না।

বেসামরিক লোকজনের দায় নেই, তবু তারা কেন নিশ্চিত মরনকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত। নিশ্চয় করে বলা যায়, এটা স্বতস্ফূর্ত ভালোবাসা, ইহা দেশপ্রেম। আবার সামরিক লোকজন কি কেবল বাধ্যবাধকতার জন্যই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে? যদি কেবল সে-কারণে করে, অর্থাৎ সেখানে স্বতস্ফূর্ত ভালোবাসা না থাকে তাহলে, তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পন্ন হয়েছে এ-কথা বলা যেতে পারে, কিন্তু সেটাকে দেশপ্রেম বলা যায় কি না এ প্রশ্ন উঠতে পারে। অথচ এই দেশপ্রেমের ফায়সালা জর"রি।

জর"রি বিভিন্ন আঙ্গিকে। প্রথমত, দেশপ্রেম যদি থাকে তাহলে দেশকে শত্র"মুক্ত করা গুর"ত্বপুর্ণ, ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতি সেখানে বিচার্য নয়, সামান্যতমও নয়। তাহলেই স্বাধীন দেশের ক্ষমতা যখন সামরিক বাহিনী দখল করে তখন সেটা কতটা ক্ষমতার লোভে আর কতটা দেশের স্বার্থে, এ-প্রপঞ্চের বিশ্লেষণের জমিনটা মজবুত হয়। দ্বিতীয়ত, অন্যায় যুদ্ধে (যেমন সাম্রাজ্যবাদি যুদ্ধের কথাই যদি ধরি) দুদেশের সামরিক বাহিনীই কিন্তু যুদ্ধ করে। কিন্তু যে-দেশ সেই আগ্রাসনের বির"দ্ধে দেশ বাঁচানোর সংগ্রাম করছে তাদের সামরিক বাহিনীর (এখানে বেসামরিক যোদ্ধাদের বিবেচনায় আনা হ"ছে না) সংগ্রামের সাথে দেশপ্রেমের চেতনার যে ঐক্য, সেটা কি সত্যিকার অর্থেই আগ্রাসি বাহিনীর যোদ্ধাদের থাকে? অথবা থাকা সম্ভব? বাস্ব তো বলে, না। এবং এই যে চেতনার কথা বলা হ"ছে, সেটা এতোটাই জর"রি যে, সেটার উপস্থিতিতে সংগ্রামী চেতনার জমিন এতোই মজবুত হয় যে, আমার মনে হয় সে কারণেই শেষ পর্যন্ ভিয়েতনাম-আফগানিস্তান থেকে শেষ পর্যন্ আগ্রাসি আমেরিকাকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে অতুলনীয় কম শক্তির মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে। পৃথিবীর সমস্ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পরাজয়ের ক্ষেত্রেই এই সমীকরণ প্রযোজ্য। ইতিহাসের বাস্বতাতেই একদিন ইরাক থেকেও আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে পরাজয় স্বীকার করে চলে আসতে হবে।

চেতনার জমিনের কথা বলবার আরো একটা গুর"ত্বপুর্ণ কারণ রয়েছে। আমরা ভালো করেই জানি ক্ষমতার বদৌলতে আমেরিকা সারা বিশ্বের খবর জানলেও তাদের গোপন তথ্য বাকি পৃথিবীর পক্ষে জানাটা খুব সহজ নয়। তাদের গোপন সংস্থা সিআইএ'র তো নয়ই। কিন্তু সেই শক্তিশালী সিআইএ'র তথ্যও কিছু কিছু আমরা জেনে যা"ছি। সেটা কি সবসময় সাংবাদিকরাই করছেন বা করতে পারছেন? আমেরিকা সেই সুযোগ কি দেবে? ইরাক যুদ্ধের কথাই ধরা যাক। এবার আমেরিকা তাদের সামরিক বাহিনীর সঙ্গেই তাদের মতের সমর্থক সাংবাদিক নিয়ে গেছেন, যেন সত্যিকার ঘটনা পুরো পৃথিবী জানতে না পারে। জেনেভো কনভেনশন অনুযায়ী এটা একটা যুদ্ধাপরাধ। কিন্তু সেখানে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বহু সাংবাদিক বাস্ব ঘটনার যতটা সম্ভব আমাদের জানিয়েছেন। তবু, লিন্ডি ইংল্যান্ডের মতো কুখ্যাত ঘটনার বিবরণ কোনো সাংবাদিকের জানার কথা নয়। এবং ধারণা করা সঙ্গত, এ-ঘটনা ফাঁসের পেছনে স্বয়ং আমেরিকান সৈন্যের ভুমিকা আছে। আমরা ইতোমধ্যে জেনে গেছি, অজস্র আমেরিকান সৈন্য আর যুদ্ধ করতে চায় না, তারা তাদের অভিভাবকের কাছে পাঠানো চিঠিতে সেটা প্রকাশ করেছে। স্রেফ প্রাণের ভয়ে তারা যুদ্ধ করতে চা"ছে না, বিষয়টার এত সরলীকরণ সম্ভব নয়। সৈন্য মাত্রই যুদ্ধে মরবার জন্য প্রস্তুত

থাকবে এটাই স্বাভাবিক। সে মরবার জন্য প্রস্তুত তো নয়ই, উপরন্তু সে এটার বিরোধিতা পর্যন্ত করছে। সহজেই বোঝা যাচ্ছে, দেশের পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেও, সে জেনে গেছে, এর সঙ্গে দেশপ্রেমের কোনো সম্পর্ক নাই। দেশপ্রেমের আবেগের সঙ্গে যুক্তির বিরোধ আছে। এবং সে জেনে গেছে ওই ছোট্ট সন্তানের মতো, যে, তারা বাবার কাজ সম্পূর্নরূপে অবৈধ। তার প্রতি ভালোবাসা থাকে কী করে!

আমাদের সেনাবাহিনী ইত্যাদি 'রক্ষক'বাহিনীতে লোক নেয়ার সময় দেশপ্রেমের বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়। পরবর্তীকালে তাদেরকে সে মোতাবেক প্রশিক্ষণও দেয়া হয়। আমাদের ধারণা, তাদের দেশপ্রেমের কোনো কমতি নাই। তাহলে, বর্তমানে তাদের নিয়ে এত এত অনৈতিকতার প্রসঙ্গ কেন আসে। আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেক সেনাবাহিনীর অফিসারকে চিনি, যাঁরা জাতিসংঘের দু-একটা শান্তিমিশনে অংশগ্রহণ করে থোক কিছু টাকা জমিয়ে অবসর গ্রহণ করতে চান (দুর্ভাগ্যজনকভাবে, তাঁদেরই একজন শান্তিমিশনে কাজ করতে গিয়ে শহীদ হন। তাঁর আর অবসর গ্রহণ করা হয়নি)। অর্থাৎ, ব্যক্তিগত অর্জনের পর আর বেশি কিছু তাঁরা ভাবতে চান না। কিন্তু এমনতো হবার কথা ছিলো না। তাহলে তাদের মধ্যে কেবল যে অনৈতিকতা বাসা বেঁধেছে তা-ই নয়, অনেকে সেটা বুঝতে পেরে দায়িত্ব ত্যাগ করতেও চাচ্ছেন।

একতরফা শুধু সেটার সমালোচনা না করে বিষয়টার একটু গভীরে দৃষ্টি দেয়া জরুরি বোধ করি। স্বাধীনতা-মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কবর দেয়ার যত প্রয়াসই অব্যাহত থাকুক, এখনও আমাদের বিশ্বাস, মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ কোটি বাঙালির হৃদয়ে আজো অনুরণন ঘটায়, যুদ্ধের গান আজো আমাদের রক্তে জোয়ার তোলে। তাই, একজন মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুতে তার কফিন যখন বাংলার লাল-সবুজ পতাকায় আবৃত হয়, তখন মৃত-মুক্তিযোদ্ধার মতো আমাদের বক্ষও প্রশস্ত হয়ে ওঠে; বিউগলের শব্দে আমাদের চোখ ছলোছলো হয়। নিজেকে তখন অপরাধী-অপাংক্তেয় মনে হয়– আমার জন্য বিউগল বরাদ্দ নয় এই ভেবে।

স্বাধীনতার ইতিহাস মুছে ফেলার পাঁয়তারা অব্যাহত থাকলেও বিজয় দিবস পালনটা এখনও পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়নি। এটাও কম কিসের! কিন্তু একটা দেশের বিজয় দিবস পালনও 'বিশেষ কারণে' পিছিয়ে দেয়া হয়। কোনো 'বিশেষ কারণ' বিজয়ের চেয়ে বিশিষ্ট হতে পারে এ-আমার বোধগম্য হয়নি আজো। হয়তো আমার বোধশক্তি নিম্নমানের সে-কারণে। যাহোক, সেখানে আজো অন্তত কুচকাওয়াজ হয়, দেশের গান বাজে, আমরা আরো একবার ভেসে উঠি, সম্ভবত কর্তব্যরত সৈনিকের বক্ষ সম্প্রসারিত হয় আমার চেয়ে খানিক বেশিই। কিন্তু, সেই সশস্ত্র সালাম যে সৈনিক একজন দেশদ্রোহির জন্য করতে হয়েছে তার বক্ষের কথা ভেবে আমার বড় দুঃখ হয়। আমাদের মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের কিন্তু কুচকাওয়াজে কিংবা সশস্ত্র সালামে অংশগ্রহণ করার কথা ছিলো না। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের সংবরণ করতে পারবেন না এটাই স্বাভাবিক। তাই তাঁরা কুচকাওয়াজে অংশ নিতেন। সেই মুক্তিযোদ্ধাদেরও যেদিন দেশদ্রোহিকে সালাম করতে হয়েছে, সেদিনকার ক্ষরণ আমি দেখেছি। আর এখনতো সে কাজ যত্রতত্র করতে হয়

আমাদের সৈনিকদের। আমাদের সামরিক সদস্যরাও জেনে গেছে, আমার প্রেমের পাত্রই তো ভুল। ফুল ভেবে আমি ভুল ভালোবাসিয়াছি।

হয়তো এ-বঙ্গেই একদিন দেশদ্রোহির মৃত্যুতে তার কফিন ঢেকে যাবে লাল-সবুজ পতাকায়। পতাকার ক্রন্দন আমরা শুনতে পাবো না, আমরা এতোটাই বধির। বিউগলের কান্না হয়তো শুনতে পাবো, চোখে জল দেখতে পাবো কর্তব্যরত সামরিক সদস্যদের চোখেও হয়তোবা। তখন, সে ক্ষরণ, সে ক্রন্দন মৃতের শোকের ক্রন্দন বলে যদি ভুল করে বসি, সে ভয়ে ডুঁকরে কেঁদে উঠি।